Mankar College
Mankar, Purba Bardhaman -713144, West Bengal
(Affiliated to The University of Burdwan)

****

STUDY MATERIAL

Subject	Bengali (Honours)
Section	U.G.
Semester	VI
Course Code	CC-13
Title	Engreji Sahityer Itihas
Prepared by	Dr.Arijit Bhattacharyya

টি.এস.এলিয়ট

টি.এস.এলিয়ট। পূর্ণ নাম টমাস স্টার্নস এলিয়ট। মূলত কবি হিসেবেই সারা বিশ্বে এক নামে পরিচিত। তবে প্রাবন্ধিক, প্রকাশক, নাট্যকার, সাহিত্য ও সমাজ-সমালোচক হিসেবে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পচনশীল, ফাটল-ধরা সমাজের প্রতিচ্ছবি উঠে আসে টি এস এলিয়ট নামের সঙ্গে। নিজস্ব সাহিত্যকর্ম, বিশেষত কবিতায় তৎকালীন মানুষ ও সমাজের বাস্তব চিত্র পূর্ণাঙ্গরূপে তুলে ধরতে পেরেছিলেন বলেই তার নাম একটি যুগের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর অন্যান্য লেখকদের মতোই এলিয়ট চেয়েছেন, তার কবিতায় সমসাময়িক মানবিকতার ভঙ্গুর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ফুটে উঠুক। ভিক্টোরিয়ান যুগের আদর্শের যবনিকা এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্নায়ুবৈকল্য এলিয়টকে রোমান্টিক সাহিত্যিক আদর্শ পরিহার করে কবিতার মাধ্যমে পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে উৎসাহ জুগিয়েছিল।

১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই শুরু হওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর। তবে রেখে গিয়েছিল এক বিভীষিকাময় সমাজ। বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বোমা ও অস্ত্র কেবল প্রতিপক্ষের দুর্গকেই চূর্ণবিচূর্ণ করেনি, ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল মানুষের প্রতি মানুষের

বিশ্বাস, আস্থা, ভালোবাসা ও বন্ধনকেও। মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল এক ভয়াবহ রোগে- বিচ্ছিন্নতাবোধ, যা মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল দেশান্তরে।

একটি নবজাতকের মায়ের সঙ্গে তার নাড়ি অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। জন্মের পরই সেই নাড়ি কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এক রূপান্তরিত পৃথিবীতে মানুষের মাঝে এক বোধের জন্ম হলো। সে বুঝতে শিখল, জন্মের পর সৃষ্ট এই বিচ্ছিন্নতাই পরম সত্য ও অকাট্য। চারদিকে শুধু ধ্বংস, সম্পর্কের টানাপোড়েন, বিচ্ছিন্নতা আর ব্যবচ্ছেদ। বিশ্বযুদ্ধে যারা বেঁচে গিয়েছিলেন, তারাও হঠাৎ পরিবর্তিত পৃথিবীতে স্বর্গচ্যুত অ্যাডামের মতো নিঃসঙ্গতায় হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন, সমাজে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার তীব্র অন্তর্দহন-সংকটে পড়েছিলেন।

পরিবর্তিত সমাজের এসব চিত্র এলিয়ট তুলে ‘এনেছেন দ্য লাভ সং অব জে আলফ্রেড প্রুফ্রক’, *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড, দ্য হলৌ মেন*-সহ তার বিভিন্ন কাব্যে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও যখন জর্জিয়ান কবিতার রোমান্টিকতার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় এলিয়টের অমর কবিতা ‘দ্য লাভ সং অবে জে আলফ্রেড প্রুফ্রক’। এ কবিতায় রোমান্টিকতার অনুষঙ্গ সন্ধ্যাকে ‘হাসপাতালের টেবিলে শায়িত অচেতন রোগীর’ সঙ্গে তুলনা ছিল পুরোপুরি আঁতকে ওঠার মতো, অনেকের জন্য আপত্তিকরও। কবিতায় একজন মানুষের (প্রুফ্রক) বিরামহীন চৈতন্যপ্রসূ অভিজ্ঞতা (স্ট্রিম অব কনশাসনেস), শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জড়তা, জীবনে সুযোগ হাতছাড়া করার মর্মবেদনা, আধ্যাত্মিক অগ্রগতির অসারতা, ঐন্দ্রিয়িক ভালোবাসা অনর্জন, এক কথায় একজন আধুনিক আধাখানা মানুষের পরিপূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে ‘দ্য লাভ সং অবে জে আলফ্রেড প্রুফ্রক’ কবিতায়।

দ্য ওয়েইস্ট ল্যান্ড-এর দ্বিতীয় অংশ *এ গেম অব চেজ*এবং *দ্য হলৌ মেন*কাব্যগ্রন্থে সামগ্রিক ক্ষয়িষ্ণু মানসিকতার বিকৃত মানুষ কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগে ব্যর্থ হচ্ছে, তাদের সম্পর্ক কীভাবে ‘লন্ডন ব্রিজ’ ছড়ার মতো ভেঙে পড়ছে, তা উঠে এসেছে।

*দ্য ওয়েইস্ট ল্যান্ড*কবিতার পঞ্চম অংশ *হোয়াট দ্য থানডার সেড*-এ তৎকালীন সমাজের প্রকৃত চিত্র ধরা পড়ে। সেখানে এলিয়ট লিখেছেন-

“Here is no water but only rock

Rock and no water and the sandy road

The road winding above among the mountains

Which are mountains of rock without water…"

এখানে পাথর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে, বিশ্বাসে, চিন্তাচেতনায় অসারতার রূপক। পানি হলো জীবনের অপর নাম। এটি এখানে নতুন জীবন, বিশুদ্ধতা, প্রতিশ্রুতি ও আশার প্রতীক; যার প্রকট অভাব ওয়েইস্ট ল্যান্ডে পরিণত হওয়া এলিয়টের 'আধুনিক বিশ্বে'।

এলিয়ট ১৮৮৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরির সেন্ট লুইসে জন্মগ্রহণ করলেও ১৯১৪ সালে ২৫ বছর বয়সে ইংল্যান্ড পাড়ি জমান এবং ১৯২৭ সালে সেখানকার নাগরিকত্ব পান।

১৯১৫ সালে রচিত 'দ্য লাভ সং অব জে আলফ্রেড প্রুফ্রক' কবিতার মাধ্যমে তার নাম সাহিত্যজগতে ছড়িয়ে পড়ে। কবিতাটি আধুনিকতা আন্দোলনে মাস্টারপিস হিসেবে স্বীকৃতি পায়। পরবর্তী সময়ে একে একে রচনা করেন *দ্যওয়েইস্ট ল্যান্ড*(১৯২২), *দ্য হলৌ মেন*(১৯২৫), *অ্যাশ ওয়েডনেসডে*(১৯৩০), *ফোর কোয়ার্টেটস*(১৯৪৫), *মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রল*-এর মতো কালজয়ী সব কাব্য।

তৎকালীন কাব্যধারায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৪৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন এই কিংবদন্তি। ১৯৬৫ সালের ৫ জানুয়ারি এই মহান কবির মহাপ্রয়াণ ঘটে।

আমাদের বহু কবি আছেন, যারা শত শত কবিতা লিখেছেন। তবে সাহিত্যের মানদণ্ডে তাদের স্থান হয়েছে ভাগাড়ে। অধিকাংশই অপাঙ্‌ক্তেয়। তবে কবিতা লেখার ক্ষেত্রে টি এস এলিয়ট এসব কবির মতো ছিলেন না। সংখ্যার চেয়ে বিশুদ্ধতাকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন তিনি। বলা যেতে পারে, কবিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট'। তিনি বলতেন, 'লন্ডনে আমার সুনাম গড়ে উঠেছে ছোট আয়তনের কবিতার লাইনের ওপর ভিত্তি করে এবং বছরে দুই থেকে তিনটি কবিতা ছাপানোর মধ্য দিয়ে। আমার কাছে মূল ব্যাপার হলো এগুলো হতে হবে পারফেক্ট (নিখুঁত), যেন প্রতিটি এক-একটি ঘটনা হয়ে ওঠে।'

এলিয়টের ওপর যতটা না ইংরেজ কবিদের প্রভাব ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব ছিল ফ্রেঞ্চ কবিদের। বোদলেয়ার থেকে শুরু করে পল ভালেরি- সবার লেখাই ছিল তার প্রেরণাশক্তি। সমসাময়িক ইংরেজ কবি ডব্লিউ বি ইয়েটসের ওপর লিখতে গিয়ে 'অন পয়েট্রি অ্যান্ড পয়েটস' প্রবন্ধে তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন, 'আপন কণ্ঠস্বর ব্যবহারে নিজের শিক্ষার জন্য যে ধরনের কবিতা আমার প্রয়োজন, সেগুলো ইংরেজিতে কোনোভাবেই বিদ্যমান নয়; ফরাসি সাহিতেই সেগুলোর সন্ধান মেলে।'

এলিয়টকে বলা হয় কবিদের কবি। ইংরেজি সাহিত্যের সমালোচকগণ স্বীকার করেন যে, জন মিল্টন ও ইয়েটস ছাড়া এলিয়টের মতো এমন শিক্ষিত কবির আগমন আর ঘটেনি। এলিয়টের কবিতার প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে জ্ঞানের জিহ্বাকে অচল রাখলে চলে না। তাকে সঞ্চালন করতে হয় পুরাণ, ধর্ম, অন্যান্য সাহিত্য কর্ম, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনায়। কারণ এলিয়টের কবিতা এসব বিষয়ের রেফারেন্স আর অ্যালুজনে টইটুম্বর। শুধু ইংরেজি সাহিত্য নয়- গোটা বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনেও তিনি ছিলেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

তবে টি এস এলিয়টের নাম উচ্চারণ করলেই আমাদের চোখের সামনে প্রথমেই ভেসে ওঠে একটি পতিত ভূমি (ওয়েস্ট ল্যান্ড) কিংবা অন্তঃসারশূন্য মানুষদের (*দ্য হলৌ মেন*) সমন্বয়ে গঠিত সমাজের চিত্র, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের কথা। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, টি এস এলিয়ট শুধু একজন কবি নয়, একটি যুগেরও নাম।